



কোয়ান্টাম বুলেটিন

নভেম্বর ২০১৭

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী
মনছবিকে অস্তিত্বের অংশে
পরিণত করতে হবে

শেকড়-সচেতনতা
মানুষকে সাহসী ও
শক্তিমান করে
-আলী ইমাম



আমরা বদলাতে চাই। প্রচলিত শ্রোতে ভাসমান শ্যাওলার মতো আমরা হারিয়ে যেতে চাই না। আর বদলের জন্যে দরকার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। আসলে জীবনের এই লক্ষ্যটাই হলো একজন মানুষের মনছবি। এর সাথে আমরা যত একাত্ম ও আন্তরিক হতে পারব, লক্ষ্যে পৌঁছার পথটি হবে আমাদের জন্যে তত সহজ। তাই মনছবিকে নিজের অস্তিত্বের অংশে পরিণত করতে হবে।

১৩ অক্টোবর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বার্ষিক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। চট্টগ্রামের জিইসি কনভেনশন হল-এ গুরুজীর পরিচালনায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপে অংশ নেন তিন সহস্রাধিক গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার।

গুরুজী বলেন, অধিকাংশ মানুষই আসলে জানে না সে কী চায়। জীবন থেকে সে কী প্রত্যাশা করে তা-ই সে বুঝতে পারে না। কিন্তু চাওয়াকে সংজ্ঞায়িত করতে পারাটাই অর্জনের অর্ধেক। এজন্যে নিজেকে বুঝতে পারা, নিজের শক্তি-ক্ষমতা ও ভেতরের আকৃতিটা উপলব্ধি করতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে একবার লক্ষ্য নির্ধারণ করে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে নিরলস কাজ করে যেতে পারলেই

যে-কেউ পৌঁছে যেতে পারেন মনছবির স্বর্ণদুয়ারে।

আমরা অনেক সময় আমাদের সামর্থ্য নিয়ে চিন্তা করি। কিন্তু সামর্থ্য যতই সীমিত থাকুক, পরম করুণাময় স্রষ্টা ইচ্ছা করলে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারেন। ব্যক্তি কিংবা সমষ্টি সবার ক্ষেত্রেই এটা সত্য। যেমন : সত্তরের দশকেও যে কুয়াললামপুর ছিল একটা বস্তির শহর, সেখানেই ২০ বছরের মধ্যে তারা নির্মাণ করেছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন। এটা ছিল তাদের জাতিগত সমৃদ্ধির মনছবি। বিশ্বাস ও সম্ভাবনা প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

ব্যক্তির অন্তঃশক্তি ও অফুরান সম্ভবনার দ্বার উন্মোচন করার জন্যেও প্রয়োজন এ বিশ্বাস। একজন মানুষ যখন বিশ্বাস করে, তার সবচেয়ে বড় বন্ধু তার মস্তিষ্কই তখন তাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। চারপাশের প্রকৃতিও হয়ে ওঠে তার সহায়ক। স্রষ্টার করুণা বর্ধিত হয় তার জীবনে এবং কাজে।

কারণ বিশ্বাস করতে শুরু করার মধ্য দিয়েই মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে তার কী আছে সে ব্যাপারে। এটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ। এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা একজন মানুষকে ইতিবাচকতায় উদ্ভুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তোলে।

আসলে জীবনে সাফল্য ও প্রশান্তি অর্জনের জন্যে ইতিবাচকতার কোনো বিকল্প নেই। প্রো-একটিভিটি বা ইতিবাচকতা হলো কল্যাণ ও শাস্বত ধর্মের পথ। অন্যদিকে নেতিবাচকতা হলো অধর্ম ও অকল্যাণের পথ। এটা শয়তানের পথ। ফলে নেতিবাচকতায় আক্রান্ত হলেই মানুষ হতাশা, বিষণ্ণতা, সংশয় ও দ্বিধায় ভুগতে শুরু করে। তখন সে আর বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে না। তার মনছবিও হয়ে যায় নিভু নিভু চেরাগের মতো ম্রিয়মাণ। এর পরিণতি হলো নিজের ও অন্যের ওপর জুলুম। নিজের শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিকশিত না করাও কিন্তু এক ধরনের জুলুম।

তাই বিশ্বাস ও ইতিবাচকতার সাথে কাজে লেগে থাকতে হবে। তাহলে নেতিবাচকতা কখনো জীবনকে স্পর্শ করতে পারবে না। মনছবিও পরিণত হবে আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে। কোয়ান্টাম গত দু-যুগ ধরে এই কল্যাণচেতনা ও চিরায়ত সত্যকেই তুলে ধরেছে। এ সত্য নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আত্ম উন্নয়ন ও সৃষ্টির সেবামূলক কাজের সাথে একাত্ম ও সম্ভাবনা থাকুন। সবসময় ইতিবাচক পরিমণ্ডলে থাকুন। ইতিবাচকতার নিরন্তর চর্চায় এগিয়ে চলুন সাফল্যের সরলপথে।

শেকড়-সচেতন না হলে মানুষ উদ্ধাস্ত হয়ে যায়, কালশ্রোতে হারিয়ে যায়। শেকড় সম্বন্ধে উদাসীনতা একটি অপসংস্কৃতি, যা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন হয়ে একটি জাতি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই জানতে হবে নিজেদের ইতিহাস। করতে হবে শেকড়-সন্ধান। তাহলে সাহস বাড়বে, শক্তি বাড়বে। চিন্তাশক্তি উদ্দীপ্ত হবে।

চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে মেডিটেশন হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাশ্চাত্যও এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকছে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে মেডিটেশনের জন্যে বরাদ্দ রয়েছে আলাদা কক্ষ। ওদের কর্মকর্তারা সেখানে মেডিটেশন করেন। না হলে হয়তো এতদিনে আরো কয়েকটি যুদ্ধ লেগে যেত পৃথিবীতে! গুগলের কর্মীদের জন্যেও মেডিটেশন বাধ্যতামূলক। কেননা মেডিটেশন করলে চিন্তাশক্তি ও কর্মদক্ষতা বাড়ে। আর সারা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত যে, এই মেডিটেশন-ধ্যান এগুলো আমাদেরই এ অঞ্চলের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

১২ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আলী ইমাম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪৩৭ ব্যাচ ১১ ঢাকা

৮, ৯, ১০ ও ১১ ডিসেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ। অক্লান্ত পরিশ্রম ও মমতায় তিনি এদেশে গড়ে তুলেছেন প্রোগ্রামিং-এ বিশ্বমানের এক দক্ষ প্রজন্ম। তার হাত ধরেই এদেশের তরুণরা অংশ নিতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এসিএম আইসিপিএসি-তে। বাংলাদেশে গণিত অলিম্পিয়াড শুরু করার ক্ষেত্রেও তিনি একজন নেপথ্য নায়ক। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় তার প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন এখানে তুলে ধরা হলো।

আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ



গত শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান গণিতবেত্তা পল আর্ডশ। বিশ্বখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান এই গণিতজ্ঞের ব্যাপারে একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, তার যাবতীয় সম্পদ একটা মাত্র টিনের বাক্সেই রাখা যেত, ওটা নিয়েই তিনি ক্রমাগত এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াতেন। সারা বছরে পৃথিবীর অন্তত ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে অংশ নিতেন। আর ওসব সেমিনারে তার পাশের সিটে কেউ দেড়-দুই মিনিটের বেশি বসতে পারত না। কারণ বিজ্ঞানীরা যিনি যে সমস্যার সমাধান বের করতে পারতেন না, তিনি সেই সিটে বসে সেটা আর্ডশকে বলতেন। শুনে তিনি একটুক্ষণ বিমোহিত, তারপর মিনিট দুয়েক পরেই সমাধানটা বলে দিতেন। এবং ওটাই একটা রিসার্চ পেপার হয়ে যেত।

একদিন শুনি পল আর্ডশ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। আমি তখন ফ্লিভার্স ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে ডক্টরেট করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ডশকে অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব পেলে যে দুজন, তার মধ্যে সেবার আমিও ছিলাম।

ভদ্রলোককে সেই আমার প্রথম দেখা। গাড়ি থেকে খুবই ছোটখাটো একজন মানুষ নামলেন। পুরনু লেসের চশমা দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হোয়াট ইজ ইওর প্রবলেম? একজন আগন্তুকের প্রতি সাধারণত ওটাই হতো তার প্রথম বাক্য।

যা-ই হোক, প্রবলেমটা বললাম। মিনিটখানেক পর তিনি বললেন, ইট ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট প্রবলেম। একসময় তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। যতদূর বুঝলাম নামটা তার পছন্দ হলো না। বললেন, কলকাতা পর্যন্ত গেলেও বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ হয় নি। খুব গরিব দেশ।

আমি বললাম, আপনি কীভাবে দেখছেন তার ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশ গরিব কিনা। অস্ট্রেলিয়া আমাদের চেয়ে ৮৭ গুণ বড় দেশ। কিন্তু প্রতি বর্গকিলোমিটারে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের জনঘনত্ব বেশি। আমার উত্তর শুনে তিনি বেশ সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

সেদিনের মতো আমি আজও বিশ্বাস করি—আমরা আসলেই গর্ববোধ করতে পারি যে, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদে এত ছোট জায়গায় এত মানুষ টিকে আছে। আমাদের গর্ব করার আরো কারণ আছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে অবস্থা তাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে গিয়ে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান পারার কথা নয়। কিন্তু ওরা ঠিকই পারছে।

লেখাপড়ায় ভারতের অনেক নামডাক। কিন্তু পদক তালিকায় তারা আমাদের চেয়ে পিছিয়ে। এ-বছরই ইরানে অনুষ্ঠিত ইনফরমেটিভ অলিম্পিয়াডে আমরা ব্রোঞ্জ পেয়েছি চারটা, আর ভারত তিনটা।

১৯৯৯ সালে আইআইটি কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইবিএম ইন্ডিয়ার প্রধান বললেন, ১৯৯৮-এ বিশ্বসুন্দরী হয়েছে ভারত থেকে। আগামীকাল প্রমাণ করব মেধায়ও আমরা শ্রেষ্ঠ। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রানার-আপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যেন পরিণত হলো এক শোকসভায়। পরের বছরও একই ফলাফল করলাম আমরা।

আসলে সময় এখন বাংলাদেশের। বিশ্বসেরা হওয়ার মেধা আমাদের ছেলেমেয়েদের আছে। তাদের প্রাণশক্তিও অনেক। এই প্রাণশক্তি নিয়ে একটু চেষ্টা করলেই আমরা বহুদূর যেতে পারি। কোরিয়া যেমন পেরেছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানে ওরা দারুণ উন্নতি করেছে। তাদের ভদ্রতাবোধও অসাধারণ। চলন্ত সিঁড়িতে কারো হয়তো খুব দ্রুত যাওয়া দরকার। তিনি সামনের জনকে

‘এক্সকিউজ মি’-ও বলবেন না। চুপচাপ পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন, সামনের যাত্রী কোনোভাবে যদি জায়গা ছেড়ে দেয়ার কথা নিজে থেকে বুঝতে পারেন, এই আশায়।

কোরিয়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দেখছি, কোনো মা হয়তো তার সন্তানকে নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। অন্য রাস্তায় চলে যাওয়ার সময় সেই মা তার সন্তানকে বলবেন—হাত নেড়ে সে যেন আমাকে বিদায় জানায়। এটাই তো উন্নয়ন-অনুকূল সংস্কৃতি। এই জায়গাগুলোতে আমাদের উন্নতি প্রয়োজন।

সেইসাথে কমাতে হবে আমাদের অপচয় করার প্রবণতা। এদেশে যত খুশি গাড়ি কেনা যায়। সিঙ্গাপুরে, জাপানে ইচ্ছা করলেই গাড়ি কেনা যায় না। সুইজারল্যান্ডের মতো ধনী দেশে পুরো বিল্ডিংয়ের মানুষ একটা ওয়াশিং মেশিন ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে। আর আমাদের দেশে প্রতি পরিবারে আলাদা ওয়াশিং মেশিন। যা উন্নয়ন-অনুকূল সংস্কৃতি হতে পারে না।

পৃথিবীর অনেক দেশেই উন্নয়ন-অনুকূল সংস্কৃতির চর্চা আছে। রাশিয়াতে পড়ার সময় দেখছি, লেনিনের জন্মদিন তারা পালন করত রাস্তাঘাট-পার্ক পরিষ্কার করে। নেতার জন্মদিন পালনের কী অভিনব পদ্ধতি! এভাবেই তো একটি দেশ এগিয়ে যায়।

গ্রীষ্মের ছুটিতে রাশিয়ান শিক্ষার্থীরা চলে যেত সাইবেরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে রেললাইন তৈরি করে তারপর যেতে হতো। শিক্ষার্থীরা ওখানে শহর নির্মাণ করে ফিরে আসত। এর মধ্য দিয়ে ওদের হৃদয়ে দেশপ্রেম প্রোথিত হতো—আমি আমার দেশের একটা শহর তৈরিতে অবদান রেখেছি!

পার্শ্ববর্তী দেশেও দেশপ্রেমের মাত্রাটা এমনই। একবার লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর যাচ্ছি। গঙ্গার ওপরে একটা ব্রিজ দেখিয়ে ট্যাক্সিচালককে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কবে বানানো হয়েছে? সে গর্বের সাথে বলল, ১৯৭১ সালে এবং এটা বানিয়েছে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা! এই হলো একজন অশিক্ষিত ট্যাক্সিচালকের দেশপ্রেম। আমরা কি এমন একটা ব্রিজ বা ভবন দেখিয়ে এভাবে বলতে পারব যে, এটা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বানিয়েছে?

দেশ জাতি সমাজের প্রতি ভালবাসা গড়ে উঠবে এমন কর্মসূচি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো অনুপস্থিত। একসময় কোরিয়া মালয়েশিয়া থেকে ছাত্ররা বাংলাদেশে পড়তে আসত। এখন উল্টো এসব দেশে আমরা পড়তে যাই। এ থেকে বোঝা যায়, অন্তত জ্ঞানবিজ্ঞানে আমরা তেমন এগোচ্ছি না।

একসময় পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কোনো এক জায়গায় থাকত। একসময় একে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। এখন কি কেউ এ কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারবে?

এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য একটাই—আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আমরা যদি বুঝতে পারি আমাদের অবস্থান কোথায় তাহলে বুঝতে পারব কোনদিকে হাঁটতে হবে, কোনদিকে আমাদের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

আমাদের নাগরিকদের মধ্যে তাই আজ এমন একটা সচেতনতা দরকার—যারা আমাদের উন্নতি কীভাবে হবে সেটা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিন্তা করবে। শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিকভাবে দৃঢ় হবে। দেশের সীমিত সম্পদ ব্যবহারে পরিচয় দেবে উদ্ভাবনী শক্তির। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সমাজের মানুষের মধ্যে এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যা দেশ ও জাতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

অনুলিখিত

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। আমি ৪০০ তম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের একজন গ্রাজুয়েট। কোর্সে অংশ নেয়ার পর আমার দীর্ঘ ২১ বছরের সাইনুসাইটিস ও মাইগ্রেন ভালো হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য কিছু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে আমাকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হচ্ছিল। এ ওষুধগুলো প্রায় আট বছর ধরে খাচ্ছিলাম এবং মাসে আমার ছয় হাজার টাকার ওষুধ খেতে হতো। ডাক্তার আমাকে সরাসরি বলে দিয়েছিলেন যে, আমাকে সারাজীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে।

কোর্স করার পর আমি নিয়মিত মেডিটেশন করেছি। এর ফলে ধীরে ধীরে আমার অসুস্থতা কমতে লাগল। এক পর্যায়ে ডাক্তার আমার ওষুধের ডোজও কমিয়ে দিলেন। কোর্স করার দুই মাস পর আমি লামায় কোয়ান্টায়নে অংশ নিই। লামা যাওয়ার সময় ওষুধ নিতে ভুলে গেলাম এবং ওখানে এই ওষুধ

পাওয়াও যাচ্ছিল না। এজন্যে আমার মধ্যে একধরনের টেনশন কাজ করছিল। এরপর নিজের সুস্থতার জন্যে লামা মসজিদে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি এবং আরোগ্যালার দোয়াতেও অংশ নিই।

দ্বিতীয় দিন থেকেই অনুভব করলাম, আমি ওষুধ ছাড়াই সুস্থ আছি। কোনো অস্বস্তিও বোধ করছি না। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোয়ান্টায়নের পর থেকেই আমার আর কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় নি।

গুরুজী, সুস্থতার এই অনুভূতিটা যে কত বড় পাওয়া তা বলে বোঝাতে পারব না। রোগের যে যন্ত্রণা, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। অসুস্থতার জন্যে আগে আমি পরিবারের মানুষগুলোর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতাম। অল্পতেই রেগে যেতাম, মেজাজ সবসময় খিটখিটে হয়ে থাকত। আমার সন্তানদের কাছে এসে কোনো আবদার করতেও ভয় পেত।

অথচ এখন আমি একেবারেই অন্য মানুষ। আমি সুস্থ আছি এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে খুব ভালো আছি। আমি ফাউন্ডেশনের থোথামগুলোতে নিয়মিত অংশ নিই। যত ব্যস্ততাই থাকুক, প্রতি শুক্রবার আমি সাদাকায়নে যাই।

গুরুজী, ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কাজে আমি যুক্ত থাকতে চাই। আপনি দোয়া করবেন, আমার সন্তানদের যেন আমি আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

সানজিদা ইয়াসমিন
গৃহিণী
৪০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



facebook



ফেসবুক আসক্তি ॥ মাদকের মতোই ভয়ংকর

বিশ্বব্যাপী ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্প্রতি ২০০ কোটি ছাড়িয়েছে। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। রীতিমতো পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে। সমীক্ষা বলছে, বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফেসবুক ব্যবহারকারীর শহর আমাদের ঢাকা মহানগরী! তবে এ সংবাদে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ নেই মোটেই। কেননা গবেষকদের মতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে ক্রমেই করে তুলছে অসামাজিক নিক্রিয় প্রাণী।

লাইক : নকল আনন্দের বাহরি ঝুমঝুমি

ফেসবুক দ্রুতগতিতে সর্বমহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'লাইক' ফিচারটি চালু হওয়ার পর। লাইক পাওয়ার জন্যে খ্যাপাটে উসকানিমূলক মন্তব্য বা ছবি পোস্টের ঘটনাও কম নয়। মজার বিষয় : লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজেই তার ফোন থেকে এই ফিচারটি সরিয়ে ফেলেছেন। কেন? আসক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে! নিজেই বলেছেন সে-কথা।

শুধু তা-ই নয়। অন্যান্য সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাপও তিনি ফোন থেকে মুছে দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এসব অ্যাপ মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে আর মানুষকে আসক্ত করে তোলে।' অ্যাপের নির্মাতারা সাবধানতা অবলম্বন করলেও অধিকাংশ ব্যবহারকারীই এ ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন।

আহাম্মকে পরিণত হচ্ছেন না তো?

ফেসবুক যেহেতু অনবরত মনোযোগের বারোটা বাজায়, তাই কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ও বিপ্লবশীল ক্ষমতা এবং আইকিউ লেভেলও কমতে থাকে ধীরে ধীরে। তাই সহজে আহাম্মক হতে চাইলে দীর্ঘসময় ফেসবুক ব্যবহার করে যে-কেউ পেতে পারে চমৎকার ফল।

কমছে মনোযোগ!

২০১৫ সালে মাইক্রোসফট পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, স্মার্টফোন-বিপ্লব ঘটায় আগে মানুষের মনোযোগের স্প্যান ছিল ১২ সেকেন্ড। এখন তা দাঁড়িয়েছে মাত্র আট সেকেন্ডে। আর সবচেয়ে কম মনোযোগের খেতাবধারী গোল্ডফিশের স্প্যান? নয় সেকেন্ড! আরো ক্ষতি হওয়ার আগেই সতর্ক হতে বলেছেন পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কলামে একই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল—'আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াই তারা সবাই একটা বিষয় লক্ষ্য করেছে। গত কয়েক বছর থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে আসছে। অনেক সময়েই মনে হয় পড়ানোর সময় আমি যেটা বলছি ছাত্রছাত্রীরা সেটা শুনছে, কিন্তু বোঝার জন্যে মস্তিষ্কটি ব্যবহার করতে তাদের ভেতর এক ধরনের অনীহা, এক ধরনের আলস্য।

এ নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি। আমার কাছে কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এটি হচ্ছে ফেসবুক জাতীয় সামাজিক নেটওয়ার্কে বাড়াবাড়ি আসক্তির ফল। এটি নিশ্চয়ই শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা। আমি একাধিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দেখেছি, মাদকে আসক্তি এবং ফেসবুকে আসক্তির মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।' (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০১৭)

স্টিভ জবস ও বিল গেটস ॥ প্রযুক্তিপণ্য থেকে ঠিকই দূরে রেখেছেন নিজের সন্তানদের

মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস ও অ্যাপল-এর প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের মতো উদ্যোক্তাদের কল্যাণে (!) স্মার্টফোন, ট্যাব, আইপ্যাড ও কম্পিউটার গেমস পৌছে গেছে পৃথিবীব্যাপী কোটি

মানুষের দ্বারা। অথচ এই প্রযুক্তিবিদরা নিজেদের সন্তানদের ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে শুরু থেকেই জারি করেছেন কঠোর নিষেধাজ্ঞা। বিল গেটস তার সন্তানদের বয়স ১৪ হওয়ার আগে মোবাইল ফোন কিনে দেন নি এবং কম্পিউটারও ব্যবহার করতে দিতেন দিনে ৪৫ মিনিটের জন্যে। আর স্টিভ জবস তো নিজের উদ্ভাবিত আইপ্যাডই কখনো ব্যবহার করতে দেন নি সন্তানদের।

এ সতর্কতা অবলম্বনের কারণ ওরা ঠিকই জানে, আইপ্যাড-আইফোন জাতীয় প্রযুক্তিপণ্য মানুষকে অতিমাত্রায় আসক্ত করে তোলে। তাই মুনাফার লোভে অপরের ঘরে অশান্তির কাঁচামাল জোগান দিলেও নিজের ঘর তারা আগলে রাখে ঠিকই।

তাই নিত্যানতুন প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিজে সচেতন হোন। এবং সন্তানদের হাতে স্মার্টফোন-আইপ্যাডরূপী এসব আসক্তি-উপকরণ তুলে দেয়ার আগে আরেকবার ভাবুন।

বাড়ছে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি-নির্ধারক সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর অর্থায়নে ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ স্কুল অব মেডিসিন একটি গবেষণা চালায়। ১,৭৮৭ জন মার্কিন তরুণের জীবনাভ্যাস পর্যালোচনা করে গবেষকরা রায় দেন, একজন তরুণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যত বেশি সময় কাটাবে, তত সে হতাশ একাকী ও বিষণ্ণ হয়ে পড়বে। গবেষকরা তাই ফেসবুককে আখ্যায়িত করেছেন 'অবসাদগ্রস্ত মানুষের আখড়া' হিসেবে।

গত কয়েক বছরে মার্কিন টিনএজারদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনেও স্মার্টফোনের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করছেন সে-দেশের মনোবিজ্ঞানীরা।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ৬ অক্টোবর ২০১৭ ও দ্য টেলিগ্রাফ, ৬ মার্চ ২০১৭

মানুষের কল্যাণে এ প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী বিস্তৃত হোক

মাহমুদ সাজ্জাদ



কোয়ান্টাম মেথড কোর্স শুধু সায়েন্স অব লিভিং নয়, আমি বলতে চাই এটা আর্ট অব লিভিং-ও। সবকিছু মিলিয়ে এ এক চমৎকার শিল্প, যা আমাদের সবার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা থেকে আমরা সবাই

উপকৃত হতে পারি। তাই আমি প্রত্যাশা করব এই প্রতিষ্ঠান আরো বড় হোক। মানুষের কল্যাণের জন্যে এ প্রতিষ্ঠান সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত হোক।

আর আমার কাছে একটা ব্যাপার অসামান্য মনে হয়েছে যে, এ কোর্সের আলোচনায় চার দিন ধরে চমৎকার সব গল্প আর উদাহরণ দিয়ে সবকিছু খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের কথাগুলো আমরা সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছি। এটা সত্যিই অসাধারণ।

[অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ৪২৯ ব্যাচ]

মেডিটেশন করে মাইগ্রেন থেকে মুক্তি পেয়েছি

রেজাউল মাওলা বেলালী



আমি প্রায় সাত বছর যাবৎ মাইগ্রেনে ভুগছিলাম। আমার মাথাব্যথা উঠলে গামছা দিয়ে মাথা বেঁধে রাখতে হতো, পেইনকিলার খেয়ে দেড়-দুই ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হতো। আমার একজন শিক্ষক

আমাকে বললেন, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলে মাথাব্যথা ভালো হয়ে যাবে।

তবে এই বিষয়টি আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল যে, মেডিটেশন কীভাবে মাইগ্রেন ভালো করবে? কিন্তু কোর্সে এসে উপলব্ধি করলাম, ওষুধ ছাড়াই মানুষের অনেক রোগ ভালো হতে পারে। মেডিটেশন করে আমি নিজেও মাইগ্রেন থেকে মুক্ত হয়েছি।

অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা থাকে যে, ইসলামের সাথে কোয়ান্টাম সাংঘর্ষিক কিনা। কিন্তু এ কোর্সের আলোচনা ও মেডিটেশনে আমি দেখেছি, কোয়ান্টাম মেথডের মূল ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ। আলহামদুলিল্লাহ! সবারই এ কোর্সে আসা উচিত।

আমি মনে করি, কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো যদি আমাদের দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এতে আমাদের দেশ উপকৃত হবে, আমাদের জাতি উপকৃত হবে।

[গ্রাফিক্স ডিজাইনার। ৪৩৩ ব্যাচ]

মনে হচ্ছে নতুন জীবন পেয়েছি আমি!

সামছুন নাহার হীরা



১২ বছর ধরে আমার ঘাড়ের অনেক ব্যথা ছিল। আমার সবসময় মন খারাপ থাকত যে, আমার দু-বছরের বাচ্চাটাকে আমি কোলে নিতে পারতাম না। বাসার কাজ ঠিকমতো করতে পারতাম না। নামাজও

পড়তে হতো চেয়ারে বসে।

গত দুই মাস ধরে আমি সাদাকায়নে অংশগ্রহণ করছি। এখন মনে হচ্ছে, আরো ১০ বছর আগে যদি এ কোর্সে আসতাম! মেডিটেশন করে ঘাড়ের ব্যথা নেই। আরো অভূতপূর্ব ব্যাপার হলো, দীর্ঘ ১২ বছর পর আমি গতকাল থেকে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি। কোর্সে এসে আমার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে নতুন জীবন পেয়েছি আমি।

ব্যথার কারণে আগে হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। কিন্তু আজ থেকে 'পারব না' কথাটি আর বলব না। এ কোর্স আমার ভেতরে বিশ্বাস এনে দিয়েছে—আমি পারি আমি করব।

[গৃহিণী। ৪৩০ ব্যাচ]

দেশের প্রতিটি মানুষ হোক ধ্যানের সাথে সম্পৃক্ত

মো. পারভেজ সাজ্জাদ

আমি সংগীতের মানুষ, গান করি। এর জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একাগ্রতা। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের দ্বিতীয় দিন আমি অনুভব করলাম, আমার একাগ্রতার পরিমাণটা আমি ধীরে ধীরে বাড়াতে পারছি।

আগের চেয়ে আমি বেশি মনোযোগ দিতে পারছি।

ধ্যানের মতো একটি বিষয়কে ধর্মবর্ণ ও মত নির্বিশেষে গুরুজী যেভাবে সার্বজনীন একটি প্ল্যাটফর্মে এনেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ। আমরা যে-কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ এখান থেকে উপকৃত হতে পারছি খুব সহজে। প্রথমে ভাবছিলাম, ১০ ঘণ্টা করে ক্লাস, এতটা সময় বসে থাকব কীভাবে? কিন্তু গুরুজীর এরকম তথ্যসমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত আলোচনা আমি আমার জীবনে কোথাও পাই নি।

নিরাময়ের জন্যে এবং ভালো থাকার জন্যে ধ্যান দোয়া দান ও দাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে বার বার বলা হয়েছে। এ বিষয়টি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমি মন থেকে প্রত্যাশা করি, আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ধ্যানের সাথে সম্পৃক্ত হোক।

[সংগীত শিল্পী। ৪৩৩ ব্যাচ]

মেডিটেশন ও দমচর্চা আমাকে দিয়েছে সুস্থতা

মো. হারুন আর রশিদ



গত আট বছর ধরে আমি শ্বাসকষ্টে ভুগছি। দেশে-বিদেশে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। সব ডাক্তারই বলেছেন, আমাকে সবসময় ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে এবং এটা সারাজীবন চলবে। শ্বাসকষ্টের জন্যে

কখনো কখনো দিনে তিন থেকে চার বার পর্যন্ত আমাকে ইনহেলার নিতে হয়েছে।

আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, সেখানকার এমডি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। তারই অনুপ্রেরণায় আমি অডিও শুনে মেডিটেশন চর্চা করছি। নিরাময়ের মেডিটেশন এবং নিয়মিত দমচর্চা করে আমি এখন বেশ সুস্থ। গত একমাস ধরে আমাকে একবারও ইনহেলার নিতে হয় নি। তারপরই উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি।

এখন আমার টেনশন অনেক কমে গেছে। আমরা যদি মনে প্রাণে মেডিটেশনকে ধারণ করতে পারি, তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব। সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন—এই চারটি বিষয় আমাদের মধ্যে থাকলে জীবনে আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

[ডেপুটি ম্যানেজার, পিপলস পোলিটিক্যাল লি.। ৪৩৩ ব্যাচ]

আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে

সিরাজুম মুনিরা

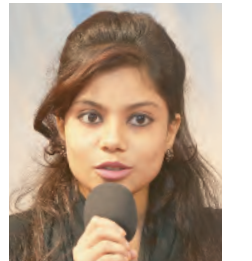
জন্মগতভাবেই আমার ডান পা একটু খাটো। আমার তিন বছর বয়সে ডাক্তারের পরামর্শে পায়ে অপারেশন করতে হয়েছিল। এসময় পুরো পা ব্যান্ডেজ করে ফেলার পায়ের নিচে রক্ত জমে গিয়েছিল।

জমে থাকা রক্ত বের করার জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা না করে ডাক্তার পায়ের গোড়ালিটা কেটে ফেলেন।

এরপর থেকে আমার পায়ের নিচে একটা ক্ষত থেকেই যায়। এই ক্ষত থেকে দিন-রাত সবসময় পানি ঝরত। সারাদিনে ১০ থেকে ২০ বার আমাকে এগুলো পরিষ্কার করতে হতো। রাতে কিছুক্ষণ পর পর উঠে পা পরিষ্কার করতে হতো। এজন্যে আমি কখনোই ভালোভাবে ঘুমাতে পারতাম না। রাত জাগার জন্যে ভোরে ঘুম থেকে উঠতেও পারতাম না।

এই চার দিন কোর্সে মেডিটেশন করে আমার পা থেকে পানি বরা অনেক কমে গেছে। এখন দিনে দুই থেকে তিন বার পরিষ্কার করলেই হচ্ছে। রাতে ভালো ঘুমাতে পারছি, কারণ পা পরিষ্কারের জন্যে আর ঘুম থেকে উঠতে হয় না। ফলে ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারছি সহজেই। এখানে এসে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।

[শিক্ষার্থী, দ্বাদশ শ্রেণি। মুমিনুন্না সারকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ। ৪৩৩ ব্যাচ]



পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন নিয়মিত চর্চা

নাদিরা কিরণ



প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিছু বাধা আসে। এসব ক্ষেত্রে আমি মাঝে মাঝে অস্থিরবোধ করতাম। আমার দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে অনেক সময় বিষয়গুলো কাটিয়ে উঠলেও ভেতরে তো হতাশাগুলো জমে।

তাই উপলব্ধি করলাম, আমার মাথাটা আরো ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন এবং জীবনে আরেকটু শান্তি প্রয়োজন। কিছুদিন আগে আমার এক সহকর্মী কোয়ান্টামের কিছু অডিও দিলেন। অডিওগুলো অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় শুনতাম। একটা সময় অনুভব করলাম, আমার মধ্যে ধীরে ধীরে একাধ্রতা বাড়ছে।

এর মধ্যে আরো কয়েকজন সহকর্মী সাংবাদিক আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের জন্যে উদ্বুদ্ধ করলেন। মেডিটেশন শেখার পরে তাদের পরিবর্তন দেখে আমি নিজেও বিস্মিত হয়ে গেলাম। দেখলাম তারা কোনোকিছুতে রাগেন না। আমি ভাবলাম, এটাই তো আমার দরকার। কারণ আমি রেগে গিয়ে যদি কাউকে বকা দেই, এতে তারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি।

কোর্সে অনেকে আসেন নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে। আবার কেউ কেউ আসেন এই ভেবে যে, চার দিনে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি মনে করি, পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন নিয়মিত চর্চা। আমি একটা অভ্যাসের পেছনে ছয় মাস ছুটিতে পারলে এরপর সে অভ্যাস আমার পেছনে ছুটিবে। এ রাস্তাটা কোয়ান্টাম আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে।

কোর্সে এসে আমার প্রাপ্তিটা অনেক বেশি। আমি গুরুজীকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তার কথাগুলো আমার সাংবাদিক জীবনে অনেক বেশি কাজে লাগবে। আমি আরো ভালো মানুষ হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

[চিফ রিপোর্টার, এটিএন বাংলা। ৪৩৩ ব্যাচ]

আমি মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই

ছিবগাত উল্লাহ গালিব

আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমার একজন শিক্ষক একদিন আমার মাথায় আঘাত করেন। এরপর থেকে আমার মাথায় যন্ত্রণা হতো আর সবসময় খুব টেনশন হতো। আমি মানসিক রোগীর মতো হয়ে



যাই। কারো সাথে মিশতে পারতাম না, কারো সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারতাম না। আমার রেজাল্টও খারাপ হতে শুরু করল। দিন যত যাচ্ছিল আমার অবস্থা তত খারাপ হচ্ছিল। একসময় আমি জন্ডিস, হেপাটাইটিস এ এবং ই-তে আক্রান্ত হই।

এরপর আমার মায়ের অনুপ্রেরণায় মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। আমি নিয়মিত তিনটি মেডিটেশন করতাম। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজের পরে করতাম দুঃখ দূর করার মেডিটেশন, অটোসাজেশন করতাম দুপুরবেলা আর রাতে করতাম নিমগ্ন পড়াশোনা মেডিটেশন। মেডিটেশন শুরু করার কিছুদিন পরেই আমি নিজের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করলাম। পড়ালেখাতেও মনোযোগ বাড়তে লাগল এবং আমি বন্ধুদের সাথে মিশতে আরম্ভ করলাম। ছয় মাস মেডিটেশন করার পর আমি হেপাটাইটিস এ এবং ই থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম।

আমি বুঝতে পারলাম, একটা জিনিসই আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে আর সেটা হলো বিশ্বাস। মেডিটেশন করে আমার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাল যে, আমি সব করতে পারব। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমি অনেক কিছু জেনেছি। আর তা হলো, রেগে গেলে মানুষ হেরে যায়, মানুষের সাথে মিলেমিশে চলতে হয় এবং মা-বাবাকে সালাম দিতে হয়। কোয়ান্টামের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমি সফল হতে চাই, মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই।

[শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, ঢাকা। ৪৩৩ ব্যাচ]

সব বয়সের সব মানুষের প্রয়োজন এ কোর্স

মো. রফিকুল ইসলাম

২০০৪ সালে আমার হার্টে বাইপাস অপারেশন হয়। কারণ আমার হার্টে ছয়টা ব্লক ছিল। তারপর থেকে আমি ভালো ছিলাম। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে অনুভব করছিলাম—আমার স্ট্রেস বেড়ে যাচ্ছে, আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না।



এরপর আমার বোনের উৎসাহে এক গুরুবাবর কোয়ান্টামের সাদাকায়ন অনুষ্ঠানে গেলাম। সেখানে শিথিলায়ন মেডিটেশন করে আমি খুব ভালো বোধ করলাম। আমার মনে হলো, আমি পরিবারের অভিভাবক এবং আমি যদি আমার রাগ-ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে আমার পরিবার এবং ব্যবসা দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরের মঙ্গলবারই আমি কোয়ান্টামের আলোকায়ন প্রোগ্রামে অংশ নিলাম এবং এখানেও খুব ভালো লাগল।

আলোকায়নে এসে কিছু বই কিনে নিলাম নিজের জন্যে, যেমন : কোয়ান্টাম মেথড, অটোসাজেশন ইত্যাদি। বইগুলো পড়ে অনুভব করলাম, বইয়ের কথাগুলো আমাকে শক্তি দিচ্ছে। গুরুজীর অডিওগুলো শুনে বাসায় মেডিটেশন শুরু করলাম। এর মধ্যে আমি জানতে পারলাম কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব সম্পর্কে এবং বনশ্রীতে হার্টের প্রোগ্রামে অংশ নিলাম।

হার্টের রোগীদের যেসব খাবার খেতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে, নিয়মিত হাঁটতে হবে—সবই আমি মেনে চলি। ডাক্তার আমাকে গুড পেশেন্ট বলেন। আমি সুস্থ আছি, ভালো আছি। কিন্তু আমি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবে এসে উপলব্ধি করলাম, ভালো আছি বলতে আমি এতদিন শুধু ভালো থাকার পাস নম্বর পেয়ে যাচ্ছি।

সেই প্রোগ্রামে গুরুজীর কর্তে একটা মেডিটেশনে যখন নিজের হৃদয়ের সাথে প্রথমবারের মতো কথা বললাম, আমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গেলাম। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো যে, আমি সারা জীবন আমার হার্টের সাথে কত দুর্ব্যবহার করেছি!

সাধারণভাবে আমরা মনে করি, গরুর মাংস খাসির মাংস খেলেই শুধু হার্টের ক্ষতি হয়। অথচ আমাদের প্রতিদিনের যে রাগ-ক্রোধ টেনশন-ক্ষোভ এগুলো সবই আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মেডিটেশনে নিজেকে কথা দিলাম, আমি এমন কোনো কাজ আর করব না যাতে আমার দেহের কোনো অঙ্গের ক্ষতি হয়।

প্রায় ১৫ বছর ধরে আমার কোমরে ব্যথা ছিল। কখনো কখনো ব্যথার কারণে একটানা ১৫ দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হতো। মেডিটেশন করে ব্যথা থেকেও নিরাময় লাভ করেছি। আমি বলব, এ কোর্স সব বয়সের সব মানুষের জন্যে প্রয়োজন। কারণ অসুস্থ হওয়ার পর এখানে এসে আরোগ্য হওয়ার চেয়ে সুস্থ থাকার কৌশল জানা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মেডিটেশন আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, গুরুজী ও মা-জী লাখো মানুষের অন্তরে আশার আলো হয়ে বেঁচে থাকবেন।

[ব্যবসায়ী। ৪৩৩ ব্যাচ]

একজন ভালো চিকিৎসক হওয়ার দিক-নির্দেশনা পেলাম

ডা. সৈয়দা আফিয়া রহমান

চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করার পর দেখলাম, রোগীরা সাধারণত একই অসুখ নিয়ে বার বার ঘুরে আসে। তাদেরকে যখন প্রেসক্রিপশনে ১০ দিনের ওষুধ লিখে দেই, দেখা যায় ওষুধ খাওয়া শেষ করে ১০ দিন পর তারা আবার আসে। আমি অনুভব করলাম, শুধু ওষুধ একজন মানুষকে সুস্থ করতে পারে না। সুস্থতার জন্যে দরকার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক আহার ও সঠিক জীবনদর্শ।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে এ বিষয়টিই আরো সুন্দরভাবে জানতে পারলাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা তথ্য-উপাত্তের আলোকে গুরুজী বললেন, আমাদের ৭৫ ভাগ রোগই হলো মনোদৈহিক। অর্থাৎ একজন রোগীকে সুস্থ করার ক্ষেত্রে মাত্র ২৫ ভাগ থাকে চিকিৎসকের হাতে আর ৭৫ ভাগ থাকে রোগীর নিজের হাতে। আর সুস্থ থাকার জন্যে, ভালো থাকার জন্যে ধ্যান হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আমার রোগীদেরকে ধ্যান দোয়া দান ও দাওয়ায় গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে চাই।

একজন ভালো চিকিৎসক হওয়ার জন্যে যে দিক-নির্দেশনাগুলো আমার প্রয়োজন ছিল, তা-ই আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স থেকে পেলাম। আমি আশা করি, কোর্সের শিক্ষাগুলোকে আমার পারিবারিক ও পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারব।

[মেডিকেল অফিসার, মনোহরদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নরসিংদী। ৪৩৩ ব্যাচ]



গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : ফেসবুক, ইমো, হোয়াটস অ্যাপ, ক্ল্যাশ অব ক্ল্যান গেম আমার জীবনটাকে পুরো শেষ করে ফেলেছে। আমি বুঝি এগুলো ভালো না, তারপরও রাতে ঘুমানোর আগে এবং সারাদিন যখনই সময় পাই ফেসবুকে না ঢুকলে বা গেম না খেললে ভালো লাগে না। গতকালও রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত খেলেছি। আমি ওগুলোর নেশায় পড়ে গেছি। প্লিজ গুরুজী, মুক্তির পথ বলবেন। আপনি বলেছেন ১১টার পর মোবাইল বন্ধ রাখতে, কিন্তু পারি না। মহাবিপদে আছি। সেভ মি এন্ড আদার্স।

উত্তর : আপনার কষ্ট ও আকুতি আমি বুঝি। আর এটা শুধু আপনার একার কষ্ট না, এই প্রজন্মের প্রায় সবারই কষ্ট। আমরা আসলে স্টিভ জবসের চক্রান্তের শিকার হয়ে গেছি। নিজের সন্তানদের হাতে তার উদ্ভাবিত আইপ্যাড তুলে দেয়ার ব্যাপারে তিনি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। অথচ তা-ই তিনি তুলে দিয়েছেন বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি পিতার সন্তানের হাতে।

যারা মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে বা নেশায় আসক্ত করে নিজেরা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে চায়, তাদের প্রতিনিধি হচ্ছে এই স্টিভ জবস, বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ এবং এ ধরনের আরো যারা আছে। এরা নিজেদের সন্তানের জন্যে এসব প্রযুক্তিগত নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু অন্যের সন্তানকে আসক্ত করেছে এই নেশায়।

যারা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে তারা জানে কীভাবে মানুষকে আসক্ত করতে হবে। তাদের গবেষণার বিষয়ই হচ্ছে এটা। এই কর্মীরাই পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়েছে এবং তাদের বয়ানেই এ বিষয়গুলো ইদানীং বেরিয়ে আসছে।

মনে রাখবেন, যেটার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন না, সেটাই একসময় আপনার ক্ষতির কারণ হবে। কারণ এটা কিন্তু একটা শক্তি। নেতিবাচক শক্তি। যেমন, গাড়ির গতির ওপর যদি আপনার নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে গাড়ি আপনার জন্যে অভিশাপ।

মোবাইল ফোনসহ এ ধরনের যন্ত্র বা তথাকথিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো এমনভাবেই তৈরি করা হয়, যাতে এর ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ না থাকে। এর উদ্ভাবকদের লক্ষ্যই হলো, এই নেশা থেকে মানুষ যেন বেরিয়ে আসতে না পারে। কারণ ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড নিয়ে মানুষ যত নেশাগ্রস্ত হবে, তত এরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

আপনি এবং আপনার মতো অনেকেই আজ পৃথিবীজুড়ে এই কুচক্রী ভার্চুয়াল মাফিয়ার ষড়যন্ত্রের শিকার। যেহেতু আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে, এটা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, তাই এই আসক্তিগুলোকে থুথু দিতে হবে। যে-কোনো মূল্যে এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আপনি ৪০ দিনের জন্যে লামায় খেদমতায়নে চলে যান। যেতে হবে কিন্তু মোবাইল, আইপ্যাডসহ এ জাতীয় সবকিছু ছেড়ে। ওখানে গিয়ে ৪০ দিন পরিশ্রম করুন, নিয়মিত মেডিটেশন করুন। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট রুটিনের মধ্যে অভ্যস্ত করুন নিজেকে। আমরা আশা করি, আপনি এক নতুন জীবন পাবেন। তবে আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার এ উদ্যোগটা নিতে হবে আপনাকেই। আপনি নিজে যদি না বদলান, আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

মনে রাখবেন, নিজের জীবনটাকে রাখতে হবে নিজের নিয়ন্ত্রণে। ভার্চুয়াল মাফিয়ার নিয়ন্ত্রণে জীবনকে ছেড়ে দেবেন না। নিজেকে বদলানোর দায়িত্ব নিজে নিন। নিয়ত করুন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন- আসক্তিমুক্ত হয়ে আমি সুস্থ জীবনে ফিরতে চাই। আমরা সবাই আপনার জন্যে দোয়া করব।

প্রশ্ন : আপনি সবসময় বলেন খারাপ সন্তানকে কীভাবে ভালো পথে আনা যায়। কিন্তু কখনো বলেন নি যে, বিভ্রান্ত মা-বাবার সন্তান তার মা-বাবার প্রতি কী রূপ আচরণ করবে? আমি মাদক ঘৃণা করি কিন্তু আমার মা-বাবা মাদকাসক্ত। আমি তাদের প্রতি কেমন আচরণ করব? আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি।

উত্তর : একজন মাদকাসক্ত সংসারে থাকলে জাহান্নাম দেখার জন্যে ঘর ছেড়ে আর কোথাও যেতে হয় না। সেখানে যদি দুজন মাদকাসক্ত হয় এবং তারা যদি মা-বাবা হয়, সেই সন্তানের কী করণ অবস্থা! তবে আপনি যে এখান পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, আপনার মনের শক্তি আছে, পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তা মোকাবেলা করার সাহস আছে। আর পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে। মানুষ যখন সাহস করে এবং সত্যিই বিশ্বাস করে যে, সে সবকিছুকে অতিক্রম করতে পারবে-সে তখন আসলেই তা পারে।

প্রথমত, জীবনটা আপনার এবং নিজের পরিচয়ে আপনাকে পরিচিত হতে হবে। এজন্যে পারিপার্শ্বিক সব প্রতিকূলতার মুখোমুখি থাকা এবং পরিস্থিতির চাপে কোনো ভুল না করে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। যেহেতু আপনি এখনো ছাত্রী, ক্লাসে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, তাহলে আপনি জীবনেও প্রথম হতে পারবেন।

সাধারণত এসময় মেয়েরা যে ভুলটা করে, তা হলো, তারা ধুরন্ধর ছেলেরদের পাল্লায় পড়ে যায়। যে একটু মিষ্টি করে কথা বলে, তাকেই জীবনের আশ্রয় মনে করে বসে। ভাবে, সে-ই হয়তো আমার জীবনটাকে বদলে দেবে। কিন্তু তা তো হয়ই না, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ছেলেরা অত্যন্ত নির্মমভাবে এ ধরনের সরলমনা মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। যার শোচনীয় মূল্য দিতে হয় ঐ মেয়েটিকে।

অতএব এরকম কাউকে আশ্রয় মনে করতে যাবেন না। মা-বাবাই যখন আশ্রয় হতে পারেন নি, তখন অন্য কেউ আশ্রয় হবে না। মজনুদের মহানুভবতার কাহিনী শুধু কিতাবে ও কবির কল্পনাতে পাওয়া যায়, বাস্তবে নয়। তাই নিজের আশ্রয় হতে হবে নিজেকেই। এই কাজটা কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু আপনি যেহেতু মেডিটেশন করছেন, নিয়মিত কোয়ান্টামে আসছেন, ইনশাআল্লাহ আপনি পারবেন। কষ্ট হবে কিন্তু পারবেন।

দ্বিতীয়ত, আপনি অন্য কাউকে মা-বাবা বানাতে পারবেন না। তাই যতটুকু পারবেন, তাদের সেবা-যত্ন করবেন। যেটুকু পারবেন না সেখানে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ তাদেরকে মাদক সরবরাহ করার দায়িত্ব আপনার না। কিন্তু অসুস্থ হলে যতটুকু দেখাশোনা করতে পারেন, যতটুকু ভালো আচরণ করতে পারেন, সেটা করবেন।

আর প্রতিদিন মেডিটেশনে কমাড সেন্টারে মা-বাবাকে মমতা দিয়ে বোঝান-যেন তারা এ গজব

থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। তারা তো আপনারই মা-বাবা। আর মা-বাবার সাথে রাগারাগি করে কোনো লাভ নেই। কারণ মাদকের প্রতি কারো আসক্তি সৃষ্টি হলে তার কাছে মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী কারোরই মূল্য থাকে না। তাদের চাই শুধু মাদক।

অতএব তাদের আচরণ দিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না। সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন যে, ঠিক আছে, আমার মা-বাবার কোনো সহযোগিতা আমি পাব না। আর এটা মেনে নিয়েই আমাকে পৃথিবীতে চলতে হবে। নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে হবে। এ বিশ্বাসটা নিয়ে সবসময় অটোসাজেশন দেবেন-আমি পারি আমি করব, আমার জীবন আমি গড়ব।

প্রশ্ন : আমি নিয়ত করেছিলাম, রোজগারের পাঁচ শতাংশ আমি মাটির ব্যাংকে দান করব। কিন্তু আমার যা রোজগার তার চেয়ে খরচ বেশি। বেশিরভাগ সময় ঋণ করে সমস্যা মেটাতে হয়। এমতাবস্থায় কী করব? যখন যা পারব তখন তা রাখব, না নতুন করে নিয়ত করব?

উত্তর : আপনার নিয়ত পরিবর্তন করবেন না। বরং টাকাটা কীভাবে আসবে সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন। চারপাশের অনেকেই অনেক টাকা রোজগার করে, কিন্তু বরকত নেই। যেরকম ইউরোপ-আমেরিকাতে মানুষ অনেক রোজগার করে কিন্তু বরকত নেই। অধিকাংশই ঋণ নিয়ে মারা যায়। আমাদের দেশে যারা ধনী, তারাও বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে ঋণী। কারো একশ কোটি, কারো তিন শ কোটি, পাঁচ শ কোটি, এমনকি হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত। তারা মরবেও এই ঋণ নিয়েই। খরচ কি তাদের কম? তাদের বাড়ি বানাতে হয়তো ৪০/৫০/৬০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু ওদিকে ঋণ আছে।

এটা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। যার প্রভাবে আপনি বৈষয়িক চিন্তায় ডুবে যাবেন, পণ্যদাস হয়ে পড়বেন। তখন আপনার খরচ বেশি হবে এবং আপনি ঋণ করে খরচ করবেন। আমৃত্যু ঋণী থেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।

এজন্যে আপনার যা প্রয়োজন তা আগে উপার্জন করবেন, তারপর ব্যয় করবেন। আর সবসময় অপচয়ের ব্যাপারে সতেন থাকবেন। আপনি নিয়ত করুন এবং প্রার্থনা করুন-‘আল্লাহ, তুমি আমার উপার্জন বাড়িয়ে দাও, উপার্জনে বরকত দাও।’ আর প্রতিদিন সকালবেলা সামর্থ্য অনুসারে দান করে আপনার দিন শুরু করুন।

আল্লাহ তায়ালা এই দানের এমন বরকত দিতে পারেন যে, দেখা যাবে আপনি খুব স্বচ্ছন্দেই আপনার আয়ের ১০%, ১৫%, ২০% দান করতে পারছেন। ফলে সবদিক থেকেই আপনার জীবন বরকতময় হয়ে উঠবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

কর্মযুক্ত বিশ্বাস সাফল্য সৃষ্টি করে।
বিশ্বাসযুক্ত উদ্যোগ সকল বাধা দূর করে।
আমার সকল উদ্যোগে থাকবে বিশ্বাসেরই অনুরণন।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোয়ান্টাম ইয়োগা

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে মেডিটেশন সভা



বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভারে (বিপিএটিসি) ‘১১৭ তম অ্যাডভান্সড কোর্স অন এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট’-এর আওতায় ৯ ও ১০ অক্টোবর দুদিনব্যাপী কোয়ান্টাম ইয়োগা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৩৬ জন পুরুষ ও চার জন মহিলা উপ-সচিব অংশগ্রহণ করেন।

১০ অক্টোবর উত্তরায় সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে একটি মেডিটেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরা শাখার সেক্টর-৭ প্রি-সেল এ সভার আয়োজন করে।

এতে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ও পেশাগত সাফল্যের জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজার নাদিম আহমেদ। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ১২৫ জন সদস্য এ সভায় অংশ নেন।

ক্রীড়ায় কোয়ান্টাদের সাফল্য

জাতীয় জিমন্যাস্টিকসে চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

তৃতীয় বয়সভিত্তিক জাতীয় জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা ২০১৭ আসরের মোট ৫৩টি পদকের মধ্যে ৩২টি পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা। বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৪-৭ অক্টোবর ঢাকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়ামে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কোয়ান্টাদের ৩২টি পদকের মধ্যে ১১টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও ১১টি ব্রোঞ্জ। উল্লেখ্য, একটি স্বর্ণসহ ছয়টি পদক পেয়ে বালক গ্রুপে সর্বোচ্চ পদকধারী হয়েছে তৃতীয় শ্রেণির মংচিং প্র মার্মা এবং বালিকা গ্রুপে একটি স্বর্ণসহ দুটি পদক পেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণির হুথিং মার্মা।

এছাড়া ৫-৭ অক্টোবর ৩৫ তম জাতীয় সিনিয়র জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের পক্ষ থেকে চার জন কোয়ান্টা অংশগ্রহণ করে। এতে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী কিতং খুমি প্যারালার কলে বারস ইভেন্টে একটি রৌপ্য ও রোমান রিং ইভেন্টে একটি ব্রোঞ্জ অর্জন করে।



৪৬ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭ হ্যাভলবে চতুর্থবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল



তৃতীয় জাতীয় যুব হ্যাভলবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭ ফাইনালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বান্দরবান জেলা দল। উল্লেখ্য, এ দলের ১২ জন খেলোয়াড়ের নয় জনই কোয়ান্টা

শুদ্ধাচার + সুবচন = সাফল্য

এক দেশে ছিল এক রাজা। তবে রূপকথার রাজাদের মতো মোটেই তার দাপট ছিল না। মন্ত্রী সেনাপতি চাকর-খানসামা প্রজা কেউই তার কোনো আদেশ পালন করত না। ধীরে ধীরে রাজামশাইয়ের অবস্থা হলো ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। সবাইকে বশ মানানোর জন্যে তিনি বোতল বোতল মন্ত্রপূত ওষুধ খেলেন, জাদুবাণ ছুড়লেন। কিছুতেই কাজ হলো না।

তার এই বিষম বিপদে ত্রাতা হয়ে দেখা দিল এক ভিনদেশি তরুণ। রাজার হাতে দুটি কাগজ দিয়ে সে বলল, এই নিন আপনার রক্ষাকবচ। কাউকে আদেশ করার আগে লাল কাগজে লেখা মন্ত্রটি পড়বেন। আর নীল কাগজের মন্ত্রটি পড়বেন সে আদেশটি পালন করার পর। আদেশ পালনকারীর মুখে হাসি দেখলে বুঝবেন যতদিন এই মন্ত্র ব্যবহার করবেন ততদিন সে আপনার বশে থাকবে।

রাজদরবারে দারুণ উত্তেজনা-এবার যদি রাজার কপাল ফেরে। দরবারের পাশ দিয়ে এক খানসামা যাচ্ছিল আস্ত মুরগির রোস্ট হাতে। রাজা তাকে ডেকে বললেন, ‘মেহেরবানি করে তুমি কি এদিকে আসবে? মুরগিটা একটু দেখাবে?’ রাজার মুখে ‘মেহেরবানি’ শব্দটা শুনে মুগ্ধ হয়ে সে রাজার সামনে হাজির হলো।

রাজা একপলক তাকিয়ে বললেন, ‘ধন্যবাদ, তুমি যেতে পারো।’ স্মিত হেসে খানসামা বিদায় নিল। অর্থাৎ বশ মেনেছে। বিস্মিত রাজা জানতে চাইলেন কীভাবে সম্ভব হলো এটা। ভিনদেশি তরুণ তখন বলল, ‘রাজামশাই, ছোটবেলায় পাঠশালায় শিখেছি শুদ্ধাচার ও সদাচরণ যে-কোনো কাজকেই বহুগুণ সহজ করে দেয়।’

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই এখন যেন গল্পের রাজার মতো। শুদ্ধাচার ও সদাচরণ সম্পর্কে বেদনাদায়ক অসচেতনতা লক্ষণীয় সর্বত্র। স্কুল বা পরিবার কোথাও শুদ্ধাচার শিক্ষার নেই কোনো বালাই। ফলে শিশুরাও বেড়ে উঠছে এক ধরনের রুঢ়, অমার্জিত, অশোভন মানুষ হিসেবে। এজন্যে বিভিন্ন পরিমণ্ডলে তাদের বিস্তার বিড়ম্বনা ও ভোগান্তিও পোহাতে হয় বটে।

জাতীয় জীবনে শুদ্ধাচার চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ফাউন্ডেশন তাই শুরু থেকেই শিশুচার প্রসারে কাজ করেছে। সুবচন ও শিশুচারের নিয়মিত অনুশীলনে যেন একজন মানুষ তার পরিমণ্ডলে হয়ে উঠতে পারেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রাত্যহিক জীবনের নানা পরিস্থিতিতে শুদ্ধাচার চর্চার কাজটি সহজ করতে ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে ১১ পর্বের শিশুচার কণিকা ও তিন পর্বের সুবচন কণিকা।

ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে

সামাজিক মুখোশ নয়, অন্তর্গত শক্তিই হচ্ছে সত্যিকার ব্যক্তিত্ব। আর অন্তর্গত শক্তির উৎস হচ্ছে সঠিক জীবনদৃষ্টি। সঠিক জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটে রুচিসম্মত পোশাক ও প্রসাধন, সুন্দর কথোপকথন ও সদাচরণে।

ফোনাচার

ফোনে আপনার কথা বলার ধরন অপরপ্রান্তের শ্রোতার মনে আপনার বিমূর্ত ছবি দাঁড় করিয়ে দেয়। আপনার সম্পর্কে এই প্রাথমিক ধারণা শ্রোতার মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সচেতন হোন, কোথায় কখন কাকে কী বলছেন, কীভাবে বলছেন।

নতুন পরিমণ্ডলে

প্রথম পরিচয়ে আপনার আচরণই অপরপক্ষের মনে রেখাপাত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রথম ধারণাই স্থায়ী রূপ নেয়। তাই প্রথম পরিচয়ে সঠিক ও সুন্দর আচরণ অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে নিয়ে যেতে পারে বহুদূর।

কর্মজীবনে

বস সহকর্মী অধীনস্থ অভ্যাগত-বহু মানুষের সাথে প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনায় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সুন্দর আচরণ, সতর্ক ও কুশলী লেনদেনের ওপরই নির্ভর করছে আপনার কর্মজীবনের সাফল্য।



দৈনন্দিন কেনাকাটায়

কেনাকাটা বাতিক হলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ঋণ করে ভোগ্যপণ্য কিনলে আপনি পড়বেন সর্বনাশের চোরাবালিতে। দৈনন্দিন কেনাকাটায় শিশুচার অনুসরণ আপনার ভোগান্তি কমাবে, সময়ও বাঁচাবে।

দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় কিছু শুদ্ধাচার

নীতিগতভাবে অনুসরণ করুন

কারো সাথে দেখা হলে আগে সালাম বা শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করুন।

হাই উঠলে বা হাঁচি-কাশি এলে মুখের সামনে রুমাল বা হাত রাখুন।

কারো চেহারা, গায়ের রঙ, গড়ন নিয়ে মন্তব্য করে তাকে অস্বস্তিতে ফেলবেন না।

কারো ছবি তোলার আগে অনুমতি নিন।

পোশাক-প্রসাধনে

বয়স বুঝে সময় ও অনুষ্ঠান উপযোগী পোশাক ঠিক করুন।

দেখা হলেই পরিধেয় পোশাক ও সাজসজ্জা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় যাবেন না। সংক্ষেপে বাস্তবসম্মত প্রশংসা করুন।

চলারফোরায়

হেলে-দুলে বা কুঁজো হয়ে নয়; ঘাড় সোজা রেখে সামনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সহজ স্বাভাবিকভাবে হাঁটুন।

জুলন্ত সিগারেট পড়ে থাকলে নিভিয়ে দিন। কলা, বাদামের খোসা/ খালি প্যাকেট যথাস্থানে ফেলুন।

খাবার গ্রহণে

টেবিলে বসে একাই খেতে শুরু করবেন না। খাবারের প্রার্থনা করে সবাই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করুন।

খাওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় আলাপ করবেন না। গীবত বা পরচর্চা খাবারের বরকত নষ্ট করে দেয়।

ফোনাচার

আগে থেকে না বলা থাকলে বা খুব জরুরি না হলে কারো কাছে সকাল ৯টা থেকে ১টা এবং বেলা ৩টা থেকে রাত ১১টার মধ্যেই ফোন করুন।

খেতে খেতে ফোনে কথা বলবেন না।

রাস্তা পারাপার বা বাহন চালানোর সময় ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

কর্মজীবনে

হাসিমুখে আপনার দায়িত্ব পালন করুন। বিরক্তিকর কাজের বরকত নষ্ট করে দেয়।

দৈনন্দিন কেনাকাটায়

আবেগবশত বা চাকচিক্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, শুধু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই কেনাকাটা করুন।

সুবচন

সবসময় হাসিমুখে কথা বলুন। বলুন কম, শুনুন বেশি।

ঘরে ও বাইরে শুদ্ধভাবে কথা বলুন।

মন্দ কথার জবাবে সুন্দর কথা বলুন।

ধর্মবানী পাঠ

ধর্ম মানুষকে সদাচারী হওয়ার শিক্ষা দেয়। তাই প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিট নিজ নিজ ধর্মবানী পাঠ করুন।

দৈনন্দিন আলাপচারিতায়

আপনার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ বা বাক্য শ্রোতার মনে পক্ষে বা বিপক্ষে ছাপ ফেলে। তাই পারস্পরিক কথাবার্তায় সবসময় সুন্দর শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করুন। আপনি যত সুন্দরভাবে বিনিয়ের সাথে কথা বলবেন, আপনার কথার শুভ প্রভাব তত বাড়তে থাকবে। খেয়াল রাখুন, কখন কাকে কোন অবস্থায় কী বলছেন। এর মধ্য দিয়ে সুসম্পর্ক তৈরির পাশাপাশি আপনি হবেন চারপাশের মানুষের কাছে সদাচরণ ও সুবচনের মূর্ত প্রতীক।